যারা সেদিন ডেকেছিল

মৈ মৈত্রেয়ী

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

বেনারস
১৩
কান্না এবং মৃত্যু ১
২৫
চোখ
৩৪
পর্দার আড়ালে
৪৯
অদৃশ্য কেউ
৬৪
অভিশপ্ত হাইওয়ে
৭১
কান্না এবং মৃত্যু ২
৮৭

বেনারস

মাঝে প্রায় বাইশটা বছর কেটে গেছে। বয়সের ঝুলিতে অভিজ্ঞতা জমে উঠেছে একের পর এক। যদিও পিছন ফিরে তাকালে অতীতকে খুব হাল্কা লাগে কিন্তু পেরিয়ে আসা পথ মোটেই সহজ ছিল না। কেউ যখন জানতে চায় যে কোন ঘটনাটা বেশি ভয়ঙ্কর তখন সময় লাগে, নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ উত্তর দেওয়ার আগে সবকটাকে দাঁড়িপাল্লায় চাপাতে হয়, পিছিয়ে যেতে হয় বেশ কিছুটা সময়। তবে সেদিনের রাতটা যে জীবনের একটা বড় সন্ধিক্ষণ ছিল, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

"সালটা মনে হয় ১৯৫৫ কী ৫৬ হবে। বেনারস শহরের স্বনামধন্য বাঙালি শ্রী রুদ্রপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র সুপুত্রের বৌভাত অনুষ্ঠান। শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত বিশাল বাগানসহ প্রায় চল্লিশ কাঠা জমির ওপরে দু-মহলা বাড়িটিতে তিলধারণের বিন্দুমাত্র জায়গা নেই। বাড়ি থেকে মিনিটখানেক দূরে অবস্থিত গঙ্গার তীর পর্যন্ত লম্বা করে শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে - যাতে নৌকা বা লঞ্চ করে আসা অতিথিদের গায়ে রোদ না লাগে। বাগানের মধ্যে উঁচু করে বাঁধা একটা মঞ্চের ওপরে ঝলমলে পোশাকে বসে আছেন তখনকার বিখ্যাত সানাইবাদকেরা। বাড়ির পিছনদিক থেকে ভেসে আসছে রান্নার লোভনীয় গন্ধ। পাড়ার ছেলেদের হাতে বেশ কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিলেও, প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে স্বাগত জানানোর ভারটা নিজেই নিয়েছেন রুদ্রপ্রসাদবাবু। এমন অনেক অতিথি আসছেন যাদের সেইভাবে

চিনতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে খুব অমায়িকভাবে প্রশ্ন করে তাদের পরিচয় জানতে চাইছেন। কেউ বলছেন অমুকের তমুক আত্মীয়, কেউ বা "আকবরভাই জর্দা পান আনতে দিয়েছিলেন বাবু" আবার কেউ কেউ বা বলছে "কেরোসিন বাড়ন্ত তাই মাইমা বললেন নিয়ে আসতে"। সবকিছু ঠিকঠাক চললেও, অস্বস্তিটাকে কিছুতেই যেন বের করতে পারছে না। মাঝে মধ্যেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন তিনি।

পুলিশকে খবর দিয়েছেন কিন্তু তাদের ওপরে বিশেষ ভরসা করেন না রুদ্রপ্রসাদবাবু। বাইরেটা যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করলেও মনের ভেতরে পাক খেতে থাকা আতঙ্ক এবং ভয়ের আভাস মাঝে মাঝেই তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠছে। একমাত্র মাধুরীদেবী কিছুটা আন্দাজ করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করাতে রুদ্রবাবু বললেন, "চিন্তা করো না মাধু, এই ক'দিনের পরিশ্রমে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একমাত্র ছেলের বিয়ে বলে কথা! আগামীকাল থেকে বিশ্রাম নেব।" মাধুরীদেবী বুঝলেন যে কিছু একটা নিয়ে তাঁর স্বামী চিন্তিত, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। রুদ্রপ্রসাদবাবু চিঠির ব্যাপারটা তাঁর স্ত্রীকে জানান নি। বলা তো যায় না, কেউ হয়ত বদমাইশি-ও করতে পারে! তাঁর যা জীবিকা তাতে তো আর শত্রুর অভাব নেই।

এই বাড়িতে অন্দরমহল বলে কিছু নেই। রুদ্রপ্রসাদবাবুর স্ত্রী, শ্রীমতি মাধুরীদেবী হলেন উচ্চশিক্ষিত এবং প্রচন্ড সাহসী একজন মহিলা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে তিনি যে শুধু যুক্ত ছিলেন তাই নয়, বহু বিপ্লবীকেও তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কোর্টের জজসাহেব রুদ্রপ্রসাদবাবু এবং তাঁর পরিবারকে সন্দেহের তালিকাতে রাখলেও, ইংরেজ সরকার তাঁদের কাছ থেকে কোনো খবর কোনদিন বের করতে পারেনি। স্বাধীনতার পরে অবশ্য মাধুরীদেবীর চরিত্রের বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে।

তিনি একটু বেশিই ঘরোয়া হয়ে উঠেছেন। অত বড় বাড়ির দায়িত্ব, প্রায় শয্যাশায়ী শাশুড়ির সেবাযত্ন, ছেলের পড়াশোনা, আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া - সব একা হাতে করে থাকেন। এমনকি মুঘলসরাইয়ে বসবাসকারী তাঁর ছোটবেলার বন্ধুর কন্যা, কুসুমকুমারী ভট্টাচার্যকে প্রথম থেকেই ছেলের জন্য পছন্দ করে রেখেছিলেন। তবে ছেলেকে কেউই জোর করেননি, সেটা মাধুরী দেবীর কথামতো, "ভগবানের কৃপায়" আপনিই হয়ে গেছে।

যাই হোক, আসল ঘটনায় ফিরে আসা যাক। সুষ্ঠুভাবে সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে, রুদ্রবাবু তাঁর পছন্দের আরামকেদারায় একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন এবং মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এক চরম পরিস্থিতির জন্য। আগামবার্তা পেয়ে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন ঠিকই কিন্তু তাতেও কি শেষ রক্ষা হবে? অন্যদিকে, শাশুড়ির ঘরে ঢোকামাত্র সামনের খোলা কিন্তু পর্দা ঢাকা জানালায় একটা চলমান আলোর আভাস দেখতে পেলেন মাধুরীদেবী। দ্রুত পায়ে সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা অল্প ফাঁক করে দেখলেন, পাহারাদাররা মশাল নিয়ে পায়চারি করছে। তাদের দেখে অবশ্য লাঠিয়াল বলেই মনে হল। কিন্তু তারা এখানে কী করছে? তাঁর স্বামী তো এই ব্যাপারে তাঁকে কিছু জানাননি! বেশ অবাক হলেন তিনি। জানালার গ্রিল ধরে যতটা সম্ভব ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকওদিক দেখতে শুরু করলেন। শাশুড়ি মায়ের "বৌমা" ডাকাতে তাঁর চমক ভাঙল, তিনি বিছানার কাছে চলে এলেন। খুব ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে শাশুড়িমা জিজ্ঞেস করলেন "ওরা কি ঘরে ঢুকে গেছে বৌমা?"

মাথায় হাত বুলিয়ে মাধুরীদেবী বললেন, "হ্যাঁ মা। আপনাকে প্রণাম করে গেল যে। নাতবৌকে কত আদর করলেন, নাতিকে জড়িয়ে ধরলেন। আপনার মনে নেই বোধহয়।

ওহ!

ঠিক আছে মা, ওদের বলব কাল সকালে আপনার ঘরে এসে

কান্না এবং মৃত্যু ১

সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে যে জগতের অস্তিত্ব, সেই জগত নিয়ে বহুকাল ধরেই মানুষ মানুষে তর্ক বেধেছে। অবশ্য যারা এই জগতের সন্ধান পায়নি তাদের পক্ষে এই গূঢ় বিষয় মেনে নেওয়া সত্যিই অসম্ভব। কিন্তু যারা পেয়েছে! এই যেমন আমি... আমি চাইলেও কি এই জগতকে কোনদিন অস্বীকার করতে পারব? একবার, মাত্র একবার এই পর্দা ছুঁয়ে ফেললেই মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের উন্মেষ ঘটে, আর তার জেরেই সে টের পায় যে সেই অশরীরি শুভ না অশুভ।

কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের এই এলাকাটাতে তখনও আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। চারপাশে মুঠো মুঠো ফাঁকা জমি, স্থানীয় বাসিন্দাদের গুটিকয়েক বাড়ি এবং প্রচুর গাছপালায় ঘেরা শান্ত জায়গাটাকে একবার দেখেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। যদিও এটা আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নয়। চাকরি সূত্রে এক একসময়, এক এক শহরে পাড়ি দেওয়ার জন্য সবসময় সবকিছু গুছিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়। যাই হোক, ঘটনার উৎসে ফিরে আসি। একদম নতুন বিল্ডিং, রঙের গন্ধটাও মিলিয়ে যায়নি। ফ্ল্যাটটা খুব বেশি বড় না হলেও চারিদিকটা বেশ খোলামেলা এবং মাথার ওপরেই ছাদ হওয়ার জন্য আমাদের ছানারা অর্থাৎ ডন(ল্যাব) এবং কফি(খরগোশ)-এরা অবাধে ঘোরাফেরার স্বাধীনতা পাবে

- সব মিলিয়েই ঠিক করলাম যে চারতলার ডানদিকের ফ্ল্যাটটাই আমাদের জন্য একদম উপযুক্ত। আরও একটা কারণ অবশ্য ছিল, কিন্তু সেটা নিয়ে তখনও ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। তাই ইন্দ্রিয়ের ওপরে ভরসা রেখে, গনগনে ছাদের নিচে থাকাই স্থির করলাম।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যে ভুল বলে না, সেটা বুঝতে খুব বেশি সময় লাগল না। কয়েকদিনের মধ্যে একটা বিষয় আমাদের ভাবিয়ে তুলল। প্রথমদিকে অত গুরুত্ব না দিলেও, প্রায় প্রতিবার, একই জিনিস ঘটতে থাকলে সেটাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। গ্যারেজ থেকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু দোতলার ফ্ল্যাটগুলোর সামনে আসা মাত্র একটা পচা, বাজে দুর্গন্ধ বেরতে শুরু করে। অথচ সেই তলা যে শুধু ফাঁকা তাই নয়, আগেই বলেছি যে গোটা বিল্ডিং-এ আমরা ছাড়া আর কোন বাসিন্দা তখন ছিল না। তিনতলা পর্যন্ত দুর্গন্ধটা বেশ জোরদার পাওয়া যায়, তারপর থেকে গন্ধটা হাল্কা হতে হতে ঠিক আমাদের দরজার সামনে এসে শুধু যে মিলিয়েই যায় তা নয়, তার চরিত্রও পালটে যায়। সেখানে সুন্দর ধূপের গন্ধ পাই। অথচ দুই ছানা এবং আমার অ্যালার্জির জন্য, বাড়িতে ধূপের ব্যবহার প্রায় নেই। তাহলে এই গন্ধটাই বা কোথা থেকে আসে! আমি একা নই, অনি-ও টের পায় এই গন্ধ। অর্থাৎ, দুই গন্ধেরই অস্তিত্ব আছে এবং সেটা আমার মনগড়া মোটেই নয়।

ডনকে যখন বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাই, তখন একতলায় দাঁড়িয়ে বন্ধ ঘরের দিকে তাকিয়ে প্রতিবারই সে গরগর করতে থাকে। ওর এই রূপ আমাদের চেনা। অতীতের ঘটনার কথা ভেবে, ডনকে সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে আসতে হয় বারবার। নিচের দুটো তলা পার করার সময় মন আর মাথা ভারী হয়ে আসলেও, আমাদের তলাটা কিন্তু একদম আলাদা। সেখানে

এলেই একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি অনুভব করি এবং মন বলে ওঠে যে, এখানে কোনও বিপদ নেই।

এরপর যে ঘটনাটা ঘটল, সেটার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। তার আগে বলে রাখি, এই এলাকাটা এতটাই ফাঁকা যে সন্ধে ছ'টা বা রাত বারোটার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায় সবাই বেশ বয়স্ক। ডানদিকের একটা তিনতলা বাড়িতে স্বামী, স্ত্রী এবং একটি মেয়ে থাকে। তাদের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে আমাদের। যোগসূত্র, অবশ্যই আমাদের ছানারা। যাই হোক, ঘটনায় ফিরে আসা যাক।

পরে দেখেছিলাম, সেটা ছিল অমাবস্যার রাত। প্রথমবার, বোন আমাদের বাড়িতে আসবে। অচেনা জায়গা এবং ফ্ল্যাটটা বেশ ভেতরে হওয়ার জন্য, অনি ওকে নিয়ে আসতে গেল। আমি তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত। অনি বেরিয়ে যাওয়ার পরে, দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে আসতে আসতে আবার সেই সুন্দর গন্ধটা ভেসে এল। চট করে ডনের দিকে তাকালাম। সে-ও গন্ধটা পেয়েছে কারণ, দরজার কাছে গিয়ে নাক উঁচু করে কী যেন একটা শুঁকে চলেছে সে। খানিক বাদে, আমার পায়ের কাছে এসে ডন শুয়ে পড়ল। কফি তখন সারাঘরে দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর মাঝে মাঝে দাদার কাছে এসে, আদর করে দিয়ে আবার দৌড়চ্ছে সারা ঘরে। আমি ওদের সাথে আপন মনে কথা বলতে বলতে রান্না সারছি। খানিক বাদে খেয়াল করলাম যে, গন্ধটা আর নেই।

আধঘন্টার মধ্যে অনি আর বোন চলে এল। মাসি এবং বোনঝি-বোনপোর মধ্যে আদরের পালা শেষ হওয়ার পরে, অনেকক্ষণ আড্ডা চলার পর, খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম। তারপর বিয়ার আর টুকটাক স্ন্যাক্স নিয়ে, ঠিক করলাম ছাদে গিয়ে বসব। ঘটনাটা ঘটল এখানেই। আমি তখন মাদুর পাততে ব্যস্ত। অনি আর বোন

চোখ

কোন কোন দৃশ্য, কোন কোন পথ, কোন কোন চেহারা অথবা কোন কোন মুহূর্ত – চাইলেও ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। খুব সাধারণ একটা দিন, মুহূর্তের মধ্যে হয়ে ওঠে অবিস্মরণীয়। তবে যে দিনের কথা বলছি সেটা আর চার-পাঁচটা দিনের মতো অতি সাধারণ ছিল না ঠিকই, তবে আতঙ্কিত করে তোলার মত কোনও পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি।

অষ্টমঙ্গলার উপাচারকে বাদ দিয়ে সেই দিনগুলোকে বেড়াতে যাওয়ার দিনের সাথে যোগ করে নিয়েছিলাম। দুজনেরই পছন্দ পাহাড়। বড়রা বিয়ের যোগাড়যন্ত্র করলেও সেই সব কাজকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল – সিকিমের কোথায় কোথায় যাওয়া যায়।

সময়টা ছিল জানুয়ারির শেষ। গ্যাংটক পৌঁছে জানা গেল নাথুলা যাওয়ার রাস্তা দুদিন আগে পর্যটকদের জন্য খোলা হয়েছে ঠিকই, তবে অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য একদিনের মত সময় লাগবে। সময় নষ্ট করা যাবে না। তাই পরদিন একটা গাড়ি বুক করে চারপাশটা ঘুরে নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

পাহাড় অনেকটা আমাদের মনের মতো। প্রতিটা পরিস্থিতিতে তার আলাদা আলাদা রূপ, আলাদা আলাদা বর্ণ, আলাদা আলাদা গন্ধ। মুড অফ হলে মুখ ভার, আনন্দ পেলে চকমকি পাথরের মত আলোর ঝলকানি, কান্না পেলে নদী এবং কাউকে কাছে পেতে

হলে ঠান্ডার জবুথবু বাহানা। রাস্তার গা ঘেঁষে থাকা খাদের ওপারের কাঞ্চনজঙ্ঘায় চোখ আটকে যায়। যদিও সেদিন সে অবগাহন থেকে পুরোপুরি ভাবে বেরতে পারেনি, তবু একটা জলছবি আঁকা আছে আর সমতলের মানুষের চোখ যেন তাতেই জ্বলজ্বল করে উঠল। আরেকপাশে, সবুজে মোড়া সুবিশাল পর্বতশ্রেণী। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে ছোট ছোট বাড়ির সামনে বাগানের শোভা না থাকলে হয়ত পাহাড়ের শোভাও এতটা বৃদ্ধি পেত না।

বেশ ফাঁকা ফাঁকায় ঘুরে বেড়ানোর পর সন্ধে নাগাদ ফিরে এলাম হোটেলে। সেখান থেকে জানাল যে, আগামীকাল নাথুলা যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দিনের শুরুটা ভালো হলেও শেষটার ওপরেই নির্ভর করে গোটা দিনের পরিপূর্ণতা।

দিনের আলো তখনও ফোটেনি। ঘুম থেকে উঠেই তড়িঘড়ি গিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল অনিমেষ। বিছানা থেকে আধশোয়া হয়ে দেখলাম, ঘন নীল সাদা আকাশের শেষটা মিশেছে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায়। মেঘের পর্দা নেই, কৃত্রিমতার ভ্রূকুটি নেই, শুধু আছে সাদা ধবধবে ঘুমন্ত বুদ্ধের গোটা শরীর। কিন্তু দিনটা শেষ হওয়ার আগে যে ঘটনাগুলো ঘটল তাতে মনে হয়েছিল, কাঞ্চনজঙ্ঘা হয়ত কিছু বলতে চেয়েছিল। সে চেয়েছিল ঐরকম একটা আতঙ্কিত দিনের সূচনায় একটু মিষ্টত্ব আনতে। সত্যি বলব? সে সফল হয়নি।

ল্যান্ড-রোভারে মোট পাঁচজোড়া নববিবাহিত দম্পতি। পাশের মানুষটার হাত ধরে পাহাড় দেখতে সবাই এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে পরিচয় পর্ব তখনও শুরু হয়নি।

ছাঙ্গু লেক পেরোনোর পর থেকে শুরু হল বরফের রাস্তা। গাড়ির গতি খুব ধীরে। অবশেষে নাথুলা-য় পৌছলাম। সেখানে খানিক ঘোরাফেরা করে, সৈনিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবারের গন্তব্য বাবা-মন্দির। আর এইখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত।

বাবা-মন্দিরে তখন বেশ কিছু গাড়ির ভিড়। গাড়ি থেকে নেমে বাঁদিকে একটা জলাশয় আর সেই জলাশয় সৃষ্টিকারী ঝরনা, পাশের পাহাড়ের গায়ে বীর দর্পে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলা বাহুল্য মা আর ছানা দুজনেই বরফাবৃত। উল্টোদিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল মন্দিরের খোলা চত্বর। একটা বড় দালান, তার বাঁদিকে পরপর কয়েকটা ঘর আর দালানটা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে আরও কয়েকটা কামরা পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের চাতালে ওঠার মুখে একজন মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর সামনে একটি নকুলদানার থালা। হাত পাতার পর তিনি জানালেন যে, নকুলদানা নেওয়ার জন্য গ্লাভসটা খুলতে হবে। ঘটনার প্রথম গিঁট।

তাঁর কথা মতো দু'হাতের গ্লাভস খুলে, নকুলদানা খেতে খেতে গিয়ে দাঁড়ালাম বাবা হরভজন সিং-এর ঘরের সামনে। শুরুতেই চোখ ঝাপসা হয়ে এল। অজস্র ধূপের জোরালো কিন্তু সুন্দর গন্ধ আর তার সাথে যোগ হয়েছে বহু মোমবাতির ধোঁয়ার জঙ্গল। ধীরে ধীরে চোখটা সয়ে আসার পরে দেখলাম, ঘরের আয়তন নিতান্তই ছোট। ঘরের মুখোমখি কিছুটা দূরে একটা টুলের ওপর বাবা হরভজন সিং-এর একটা ফটো আর ঠিক তার পিছনে একটি ছোট জানালা। ঘরের মেঝেতে রাখা সারি সারি জলের বোতল, ধুপের ছাই আর মোমবাতির অবশিষ্ঠাংশ। অদ্ভুত এক প্রশান্তি। তাজা মনের ভেতরে কিছুটা গন্ধ পুরে নিলাম।

কথায় বলে, বিশ্বাস নামক বস্তুটির গভীরতা অনেক বেশি হলেও সেটির প্রকৃতি কিন্তু সময় বিশেষে আপেক্ষিক। জগতের সবকিছু জেনে ফেলা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এই যেমন বাবা হরভজন সিং-এর পস্থুমাস রিটায়ারমেন্ট। পূর্ব হিমালয়ের এক প্রত্যন্ত আউটপোস্টে বরফে চাপা পড়ে তিনি মারা গেছিলেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে। তেত্রিশ দিন পরে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয় এবং সসম্মানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। কথিত আছে যে,